কথোপকথনে কবি আবদুস শুকুর খান

অনুলিখন: দেবাশীষ গুহ নিয়োগী ‘রোদ্দুর’
EMAIL: roddur70@gmail.com

কী গভীর টানে একটু একটু কাছে যাই
আমরা কেউ কখনো টের পাইনা।

অথবা

কে যেন ডাকছে শূন্য থেকে শূন্যের ভেতরে...
সব দুঃখ নির্মূল করে
এত কাছে ডেকে নেবে ভাবিনি।

কিংবা

ভোরের হাতে সব সমর্পন করে শূন্য হয়েছি
তুমি সূর্যকরোজ্জ্বল মুখ তুলে ধরো।

কিছুসময় আগে প্রবাসে এক একলা গোধূলী বেলায় এইসব আশ্চর্য পংক্তির মুখোমুখি হয়েছিলাম। কবি আবদুস শুকুর খানের সঙ্গে সেই আমার প্রথম আলাপ। এক উজ্জ্বল আশাবোধে ভাস্বর তাঁর কবিতা, আমাকে মুগ্ধ করছিল নিয়তই। সেই মুগ্ধতাবোধ থেকেই সমকালীন বাংলা কবিতার এই নিরলস শিল্পীকে জানার ইচ্ছে প্রবল হয়। আমাদের যৌথ খামারের বন্ধুদল একদিন হাজির হয়েছিল কবির বাসভবনে। আমরা চেয়েছিলাম মানুষটিকে জানতে; তাঁর কবিতা চর্চার কথা, তাঁর ভাবনার কথা, তাঁর স্বপ্নের কথা শুনতে।

নিরহংকার এই মানুষটির সঙ্গে আমাদের আলাপচারিতায় জানা গেল, ১৯৫৪ সালে মেদিনীপুরের এক প্রত্যন্ত গ্রামে আবদুস শুকুর খানের জন্ম। কবির লেখালেখি শুরু সেই ছোটবেলায় ক্লাস সেভেন এইট এ পড়ার সময়। প্রথম উপন্যাসটি লিখে ফেলেন নবম শ্রেণীতে পড়ার সময়। মহিষাদল রাজ

কলেজে কেটেছে কলেজ জীবনের প্রথম ভাগ। সেই সময় তাঁর সহপাঠী রূপে পেয়েছিলেন আজকের কবি শ্যামলকান্তি দাস, তমালিক পন্ডা প্রমুখদের। এঁদের সাহচর্য ছিল তাঁর সেই সময়কার অনুপ্রেরণা।

এরপর তিনি চলে আসেন শহর কলকাতায়। বৃহত্তর জীবনের পথচলা শুরু হল। এক সহৃদয় ব্যক্তির সাহায্যে হাওড়ায় কেরী রোড অঞ্চলে থাকতে শুরু করেন; সকালে পড়ানো, রাত্রে শিবপুর দীনবন্ধু কলেজে পড়াশুনা, আর সাহিত্যের সঙ্গে সহবাস, এই ছিল তাঁর রোজকার দিনযাপন সেই সময়ে।

কথোপকথনে কবি জানালেন প্রথম কবিতা প্রকাশিত হয় ফণিভূষণ আচার্য্য সম্পাদিত মহারাজ পত্রিকায় – ১৯৭০ এর দশকে। তারপর বহু লিটল ম্যাগাজিনে লেখালেখি চলতেই থাকে। অধুনালুপ্ত মাসিক বসুমতি, যুগান্তর

এবং দেশ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে তাঁর লেখা। এই সময় আকাশবাণীতে কবিতা পাঠের আসরে আব্দুস ছিলেন নিয়মিত শিল্পী।

কবি জীবনানন্দ দাসের লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করে বারবার। কবিতার নির্মাণে আবদুস জানালেন তাঁর সচেতন প্রয়াসের কথা, তাঁর কবিতায় এক নিজস্ব ভাষা তৈরীর কথা – নিজস্ব আঙ্গিক রচনার কথা। কেমন অনুভুতিতে সিক্ত হন আব্দুস একটি কবিতার নির্মাণের সময়, প্রশ্ন রেখেছিলাম তাঁর কাছে। তিনি জানালেন লেখার সময় একটি আপাত নিরীহ ঘটনাও হয়ে উঠতে পারে সবিশেষ। কবিতার নির্মাণে প্রথম পংক্তিটি শুরু করাই বোধহয় সবচেয়ে পরিশ্রম সাধ্য – তারপর কবিতার শরীর তৈরী হয় এক ঘোর লাগা আবেশে। তাঁর কাছে এই সৃষ্টি পাঠক মনে অনুরনণ তুললেই সেই নির্মাণের সার্থকতা। তখনই নির্জন–নিভৃতে যে কবিতার সৃষ্টি, পাঠকমানসের হাত ধরে শুরু হয় তার যাত্রা – আর মহাকাল এর কষ্টিপাথরে হয় তার বিচার।

কবির এক সদ্যপ্রকাশিত কবিতার বই এর নামকরণ করেছেন – "কবির ঘরে কেউ আসে না।" বড় অভিমান ভরা এই উচ্চারণ তাঁর। তাঁকে প্রশ্ন করেছিলাম "কবির ঘরে সত্যি কী কেউ আসে না?" আবদুস জানালেন তাঁর অনুভব – কঠিন জীবন সংগ্রাম হয়ত তাঁর নিরলস সাধনাকে স্বীকৃতির সেই শিখরে পৌঁছে দিতে পারেনি। কিন্তু এই অনেক না পাওয়ার মাঝেও মণিকণিকার মত উজ্জ্বল হয়ে আছে অনেক স্মৃতি, অনেক ভালোলাগা।

এক পারিবারিক দূর্ঘটনায় বিহবল হয়ে ১৯৮৯ এর পর দীর্ঘদিন তিনি আর লেখা প্রকাশ করছিলেননা। এই সময় এক বর্ষণমুখরিত দিনে কবি অজিত বাইরি খুঁজেখুঁজে পৌঁছন তাঁর বাড়িতে। অজিতের সেই স্নেহের তিরস্কার, যা তাঁকে আবার টেনে আনে পত্রপত্রিকার জগতে, অথবা তাঁর কবিতা পড়ে শ্রদ্ধেয় সাগরময় ঘোষের অস্থির পায়চারি – এইসব সুখস্মৃতিই আজকের আবদুস কে প্রেরণা জোগায় নিরন্তর, অনেক সম্পর্কহীনতায় দাঁড়িয়েও।

কথাপ্রসঙ্গে আবদুস জানালেন সমসাময়িক অনুপম মুখোপাধ্যায় – প্রদীপ কর – পিণাকী ঠাকুর – শ্যামলকান্তি দাস – গৌরশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখদের নাম – যাঁদের লেখা তাঁকে আকৃষ্ট করে এই মুহূর্তে।

আমাদের এই কথোপকথন সেই অর্থে তো সাক্ষাতকার ছিল না। ছিল নিরলস পরিশ্রমী এক নিষ্ঠাবান কবির জীবনকে ছুঁতে চাওয়া। টুকরো টুকরো কথায়, পাঠে, বর্ণনায় সেদিনের বিকেল আমাদের সামনে হাজির করল এক গোটা মানুষকে যে প্রতিদিনের সব ক্লান্তির বাইরে গিয়ে আমাদের উন্নীত করেন এক স্বপ্নের আশাবাদের জগতে।

তাই বোধহয় দহন ও সম্মোহনে একাকার আবদুসের কবিতা আমাদের প্লাবিত করে এইভাবে...

...তার নৈঃশব্দ্যে শরীর ডুবিয়ে
যুক্ত করব দহন
তারই সান্ধ্যগানে সম্মোহিত তোমারও ভূবন
আজ তাকে পড়ছে মনে, আজ তাকে...
(সন্ধ্যা / আবদুস শুকুর খান)

আমাদের প্রকাশন পালকি-র জন্যে বিশেষ ভাবে কবি আবদুস শুকুর খান কিছু পূর্বে অপ্রকাশিত কবিতা দিয়েছেন, কৃতজ্ঞতা সহকারে তাদের সাজিয়ে দেওয়া হল পরের কয়েকটি পৃষ্ঠায়।

জলের মানুষ

জলস্তম্ভের মতো তুমি দাঁড়িয়ে আছ
জলের উপর
জানি, ছুঁলেই জল কম্পনে ভেঙ্গে যাবে
জলের পাহাড়
তাই জল ছুঁয়ে স্থির হয় থাকি
প্রার্থনায়...

বুকের প্রপাত জুড়ে এ-কার কল্লোল
আমাকে স্তব্ধ করে রাখে !
চিতা কাঠের মত পংক্তি ভেসে এসে
আমাকে ছুঁয়ে ছুঁয়ে যায় ।
নিসর্গের কোন ভাষাতে পাখি
কার ডাকে ডানা মেলে উড়ে গেল শূন্যে !
এ কোন সঙ্গীত আসে ভেসে
এ কোন সুর পাথর কেটে ঝরণা নামায়
ওই কে আমাকে লিপিবদ্ধ করে? কে?

তুমি হাত থেকে জল তুলে নিলে হাতে
জলস্তম্ভ ভেঙ্গে ভেঙ্গে জল হয়ে জলে মিশে যায়
আমি জলের মৃত্যু দেখে জলে, কবিতার
নির্মাণ ভুলে যাই।

নৈঃশব্দ্য

নৈঃশব্দ্য মুহূর্তে মনে হল, চারপাশে
কিছু না কিছু সংকেত জেগে আছে।

আমার নিবেদিত একাগ্রতা, অঙ্গ – প্রত্যঙ্গ
যেভাবে ধীরে ধীরে বাঁক নিচ্ছে
যেভাবে ভিতরে ভিতরে ভেঙ্গে পড়ছে
সমস্ত প্রতিরোধ, যার পতন শব্দ ধ্বনিত হচ্ছে
শূন্য থেকে মহাশূন্যে
যেভাবে না বলা কথার স্বর
হৃৎপিন্ড ছিঁড়ে বেরিয়ে আসতে চাইছে
মনে হল –
কাছে পিঠে তোমার নিরাকার উপস্থিতি
অমোঘ সত্যি...

তোমাকে অস্বীকার করে যতভাবে সরে আসি
তুমি তত উজ্জ্বল আলোর মত দাঁড়াও
মননে তাৎক্ষনিক প্রতিবিম্বিত হয় তোমার চলাচল

বুঝি, পৃথিবীতে তোমাকে আড়াল করার মতো
মৃত্যু ছাড়া আর কোন নৈঃশব্দ্য নেই আমার...

নকশি কাঁথা

ধানকাটা মাঠে শীতের রোদ পোহাচ্ছে
মায়ের হাতে বোনা নকশি কাঁথা ।
আমি পাখির মত নরম ঠোঁটে
তুলে আনি ধূলি নীল যত ব্যথা ।

উঠে আসে ঘুমহীন দুপুরের সুঁচসুতো
লাল-নীল সবুজে বোনা নিষ্ঠার আকাশ
উঠে আসে শৈশবের চঞ্চল বিবর্ণ দিন
অসতর্ক মুহূর্তে উঠোন জুড়ে ছড়িয়ে যায়
মুঠো মুঠো মুড়ি আর দুধশূন্য বাটি...

সারামাঠে ধানডালির মত মায়ের সুঘ্রাণ
সকালের স্নিগ্ধ মুখে সরল পবিত্র হাসি
আমি ঘোরলাগা মানুষের মতো দেখি
একাকাশ পাখি এসেছে নেমে...

কলকাকলির মাধূর্যে চেয়ে দেখি –
হাজার হাজার পাখি যেন নকশি কাঁথা ঠোঁটে
উড়ে যাচ্ছে ধূসর আকাশ থেকে
আরও গূঢ় আকাশের দিকে...

কোন এক শতাব্দীর শেষে

কোন এক শতাব্দীর শেষে
এই দীপ্ত সূর্য চিরতরে নিভে যাবে !
সেদিন আলোর পাখি যত উড়ে যাবে
                    গাঢ় আঁধার গহ্বরে
আর কোন প্রাণ খুঁজে পাবে নাকো তার অস্তিত্ব
হিম এক পৃথিবী শুনবে আঁধারের আস্ফালন।

আরও কোন এক আঁধার শতাব্দীর শেষে
আমরা হিম দম্পতি স্বপ্নময় চোখে দেখব
দূর-দিগন্ত পারে ক্ষীণতম আলোর রেখা
দেখব, কী এক আশ্চর্য আবেদনে
আমাদের অন্ধকার প্রজন্ম প্রাণ ভরে দেখছে
সেই আশ্চর্য সুন্দর...

তুমি হিম ভাষায় আমাকে বলবে –
ওই দেখ   প্রভাত হয়েছে
আমি অন্ধকার পাখিদের আর্ত চিৎকার শুনতে শুনতে
আশ্চর্য এক নতুন ভাষায় ঘোষণা করব –
ওরে নতুন প্রভাত এসেছে রে, নতুন প্রভাত...